পানরসিক শ্রীজগন্নাথ

প্রব্রাজিকা বীতভয়প্রাণা

ওড়িশার বিশ্ব-পরিচয় শ্রীজগন্নাথ। অপাণিপাদ হলেও তিনি সর্বময় কর্তা, ভাগ্যবিধাতা, বিশ্বনিয়ন্তা। তিনি কেবল পুরুষ নন, পুরুষোত্তম।

এখানে ক্ষেত্র ও দেবতা একই নামে পরিচিত—পুরুষোত্তম। উৎকলের আকাশ-বাতাস, জল-মৃত্তিকা, ধর্ম-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, জনজীবনের সারস্বত চিরন্তন সত্তা শ্রীজগন্নাথ। তিনি প্রতিটি উৎকলীয় পরিবারের একান্ত অন্তরঙ্গ সদস্য, সখা, সহোদর। তাঁকে সম্বোধন তাই কখনও সম্মানসূচক তো কখনও স্নেহসূচক; তাঁর প্রতি কখনও সংকোচপূর্ণ সমীহভরা সেবা তো কখনও প্রীতিভরা সুমধুর আলিঙ্গন। তাই মহাপ্রভু জগন্নাথের সেবাপূজার বিধিতে উৎকলীয় জীবনচর্যার অন্তরঙ্গ প্রকাশ। ওড়িশার জনপ্রিয় মুখশুদ্ধি পান তাই মহাপ্রভুর নৈবেদ্যের এক অপরিহার্য অঙ্গ।

পান এক দেবভোগ্য বস্তু। শ্রীজগন্নাথদেবকে যে পান নিবেদন করা হয়, তা 'বিড়িয়া' পান নামে পরিচিত। পানে চুনের পরিবর্তে চন্দন লেপন করা হয়। এলাচ দিয়ে পান সেজে লবঙ্গ দিয়ে পান মোড়া হয়। পান সাজা ও নিবেদনের জন্য অষ্ট আশি জন সেবক নিযুক্ত থাকেন। শ্রীবলভদ্র, শ্রীজগন্নাথ ও দেবী সুভদ্রার সকালের ভোগে দুটি করে ছয়টি 'বিড়িয়া' পান; রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিত শ্রীমাধবকে একটি—এইভাবে সাতটি পান নিবেদন করা হয়। দ্বিপ্রহর এবং সন্ধ্যার ভোগেও সাতটি করে পান নিবেদিত হয়। সময়ে সময়ে রুপোর পাত্রে ষাটটি পান রত্নসিংহাসনে মহাপ্রভুর কাছে রেখে দেওয়া হয়, যাতে তিনি ইচ্ছামতো পান খেতে পারেন। আবার রাতে শয়নের সময় চারটি করে ষোলোটি বিড়িয়া পান তাঁদের নিবেদন করা হয়। শ্রীবিমলাদেবী ও মহালক্ষ্মীকেও পান দেওয়া হয়।

পানরসিক শ্রীজগন্নাথদেবের পান খাওয়া নিয়ে অপূর্ব সুন্দর দুটি কিংবদন্তি আছে, যা মানবহৃদয়কে ভক্তিভাবে আপ্লুত করে। লোকবিশ্বাস ও লোকমানসিকতা থেকে কিংবদন্তির সৃষ্টি। তাতে ঐতিহাসিক সত্যতা আছে কী না তা নিয়ে ভক্ত আদৌ মাথা ঘামায় না। বিশ্বাস সব যুক্তি-তর্কের ঊর্ধ্বে। মানুষ যে কিংবদন্তি গড়ে তোলে, যা যুগ যুগ ধরে প্রচলিত, তা তার ধর্মবিশ্বাস থেকে সৃষ্ট এবং সেই বিশ্বাসই তাকে আধ্যাত্মিক উত্তরণের পথে

সন্ন্যাসিনী, শ্রীসারদা মঠ

এগিয়ে নিয়ে যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ঘটনা। দক্ষিণ ভারতে এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে বাস করতেন শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর এক পরম ভক্ত, সাধু চকেই দাস। অত্যন্ত দরিদ্র তিনি। মাধুকরী ও মহাপ্রভুর ভজনকীর্তন করে দিন কাটাতেন। একবার তাঁর ইচ্ছা হল পুরীধামে থাকবেন। বহু পথশ্রম স্বীকার করে তিনি শেষে শ্রীক্ষেত্রে এসে পৌঁছলেন। প্রতিদিন তিনি জগন্নাথদেবকে দর্শন করতেন ও মহাপ্রসাদ সেবন করতেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁর সঞ্চিত অর্থ শেষ হয়ে এল। কাতর হয়ে চকেই দাস মহাপ্রভুকে জানালেন, ''প্রভু মহাপ্রসাদ সেবনের জন্য আমার কাছে আর অর্থ নেই। পাণ্ডারা আমায় বিনা টাকায় মহাপ্রসাদ দেবেন না। আমাকে এমন কিছু উপায় বলে দিন যাতে আমি প্রতিদিনই মহাপ্রসাদ সেবন করতে পারি।'' ভক্তের ব্যাকুলতায় মহাপ্রভু সাধুকে স্বপ্নে জানালেন, ''তুমি অল্প কিছু অর্থ নিয়ে শ্রীমন্দিরের সামনে পান সেজে বিক্রি করো। এই ব্যবসায়ে যৎসামান্য তোমার যে লাভ হবে, তা দিয়ে তুমি মহাপ্রসাদ সেবন করতে পারবে।'' চকেই দাস তাই করলেন, শ্রীমন্দিরের সামনে অল্প অর্থে পানের ব্যবসা আরম্ভ করলেন। তাতে যা আয় হল, তাই দিয়ে তাঁর নিত্য মহাপ্রসাদ সেবনে কোনও অসুবিধা রইল না। কিছুদিন পরে তাম্বুলপ্রিয় মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের চকেই দাসের পান খেতে খুব ইচ্ছা হল। তিনি দাদা বলরামকে সঙ্গে নিয়ে বালকের বেশে চকেই দাসের দোকানে এসে বললেন, ''দাও, আমাদের পান দাও।'' কালো আর ফর্সা ফুটফুটে বালক দুটিকে দেখে চকেই দাস বললেন, ''আরে, তোমরা ছোট বাচ্চা আবার পান খাবে কী? ছোট বাচ্চারা কি পান খায়?'' দুই বালক নাছোড়বান্দা, তারা সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। বালক দুটি বলল, ''দাও দাও, পান সেজে দাও। কিন্তু আমরা যেমন তেমন পান খাই না। আমাদের চন্দন, এলাচ ও চৌষট্টি রকমের মশলা দিয়ে পান সাজিয়ে দিতে হবে।'' বাচ্চা দুটির বায়না দেখে চকেই বাবা আশ্চর্য। যাইহোক, বৃদ্ধ তাদের কথা অনুযায়ী পান সেজে দিলেন। পান মুখে দিয়ে তারা চলে যেতে উদ্যত হলে সাধুবাবা পানের দাম চাইলেন। বালক দুটি বলল, ''দাম টাম আমরা জানি না। সেসব আমাদের বাবা জানেন। তিনি তোমার টাকা মিটিয়ে দেবেন।'' এইভাবে ''আমাদের বাবা দেবেন'' বলে বলে তারা প্রতিদিন এসে পান খেয়ে চলে যায়। দেখতে দেখতে দুমাস কেটে গেল।

একদিন চকেই দাস ছেলে দুটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তোমাদের বাবা দেখতে কেমন?'' তারা বলল, ''আমাদের বাবা এলে সামনে বাজনা বাজতে থাকবে, বাবা হাতির পিঠে বসে থাকবেন। সেবকরা চামর ব্যজন করতে থাকবে, মাথায় ছত্র থাকবে।''

তার পরদিন মধ্যাহ্নের আগে দুই ঠাকুর আবার চকেই বাবার কাছে পৌঁছলেন পান খেতে। কিন্তু সাধু তাদের পান দিতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, ''তোমরা প্রথমে আমার দেনা মিটিয়ে দাও, তারপর পান দেব। তা না হলে কিছু বন্ধক রাখো। আমার দেনা মিটিয়ে দেওয়ার পর তোমাদের বন্ধক জিনিসটি ফিরিয়ে দেব।'' বালক দুটি তখন নিজেদের উত্তরীয় বন্ধক রেখে পান খেয়ে চলে গেল।

ইতোমধ্যে পূজামণ্ডপে মধ্যাহ্ন ভোগ নিবেদন আরম্ভ হয়েছে। ভোগ নিবেদনের রীতি অনুযায়ী জলগণ্ডূষের মধ্যে মহাপ্রভু কৃপা করে দর্শন দিলে সেবক বোঝেন যে প্রভু সন্তুষ্ট হয়েছেন। সেদিন সেবককে মহাপ্রভু জলগণ্ডূষে তাঁর গীতগোবিন্দ লেখা উত্তরীয় ছাড়া দর্শন দিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ মহাপ্রভুর খুব প্রিয়। তাই গীতগোবিন্দ লেখা উত্তরীয় দিয়ে তাঁকে সজ্জিত করা হয়। জলগণ্ডূষে সেই উত্তরীয় দেখতে না পেয়ে সেবক দেখলেন প্রকৃতপক্ষে উত্তরীয়টি প্রভুর

শ্রীঅঙ্গে নেই। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে উত্তরীয় না থাকলে তিনি নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না। শ্রীমন্দিরের এই ঘটনা রাজার কর্ণগোচর হল। রাজা এলেন শোভাযাত্রা করে। রাজা হাতির উপরে বসে আসছেন, চামর ব্যজন করা হচ্ছে, নানা বাদ্য ও উলুধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত। রাজা শ্রীমন্দিরের কাছে এলে সাধু চকেই দাস দেখলেন রাজাকে, আর ভাবলেন, ''বালক দুটির কথা অনুযায়ী ইনিই বোধহয় ওদের বাবা। বালক দুটির উত্তরীয় রেখে দিয়েছি বলে বোধহয় ওদের বাবা এসেছেন টাকা মিটিয়ে দিতে। ঠিক আছে, পানের যা দাম হয়, তার থেকে বেশি টাকা এদের বাবার কাছ থেকে আদায় করব।''

রাজা হাতি থেকে নেমে শ্রীমন্দিরে যাওয়ার সময় সাধুটি তাঁর পথ আটকে বললেন, ''প্রথমে আমার বকেয়া দেনা মেটান, তারপর শ্রীমন্দিরে যাবেন।'' রাজা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ''কী ব্যাপার? কীসের দেনা?''

সাধুটি বললেন, ''আপনার দুই ছেলে আমার কাছ থেকে দুমাস ধরে পান খেয়েছে অথচ দাম দেয়নি। টাকা চাইলে বলেছে, বাবা সব ধার শোধ করে দেবে।'' রাজা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ''বালক দুটি দেখতে কেমন?'' সাধু উত্তর দিলেন, ''একজন কালো আর একজন ফর্সা। দুজনের শরীরে উপবীত আছে।'' রাজা বললেন, ''কী প্রমাণ আছে, তারা আমারই সন্তান?'' সাধু বললেন, ''হ্যাঁ, প্রমাণ আছে। আমার কাছে তারা তাদের উত্তরীয় রেখে গেছে। টাকা পেলে তা ফেরত দেব।'' রাজা বললেন, ''কই দেখি সে উত্তরীয়।'' চকেই দাস বললেন, ''ওই দেখুন—পান সাজার পিঁড়ির ওপর রাখা আছে।'' রাজা দেখলেন সাধুর পান সাজার পিঁড়ির ওপর মহাপ্রভুর হারানো গীতগোবিন্দ লেখা সেই উত্তরীয়!

কেঁদে ফেললেন রাজা। সাধুর পদতলে লুটিয়ে পড়ে বললেন, ''যুগ যুগ ধরে কত মুনি ঋষি কঠোর তপস্যা করেও যাঁর দর্শন পান না, তুমি কোন তপস্যাবলে তাঁকে দর্শন করে রোজ স্বহস্তে পান সেজে খাইয়েছ? এখন বলো তোমার কত দেনা, আমি সব শোধ করে দেব।''

এতক্ষণে বিষয়টি বোধগম্য হওয়াতে সাধু কেঁদে ফেললেন ও রাজাকে বললেন, ''স্বয়ং মহাপ্রভু আমার হাতে-সাজা পান খেয়েছেন, আমি ওই টাকা নিতে পারব না। তবে যদি কিছু দিতেই চান, তাহলে এই অনুমতি দিন—সারাজীবন আমি কেবল মহাপ্রভুর জন্যই পান সাজব, আর কারও জন্য নয়। আর এখানে আমার থাকার ও প্রতিদিন মহাপ্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।''

তাই হল। সাধুটির জন্য শ্রীমন্দিরের লাগোয়া একটি বাড়ি রাজা করে দিলেন। যেহেতু সাধুটি একটি বড় ছাতার নিচে পান বিক্রি করতেন, তাই সেই বাড়িটি 'বড়ছাতা মঠ' নামে পরিচিত হল। সেদিন থেকে চকেই দাস মহাপ্রভুর জন্য রোজ পান সেজে দিতেন। তাঁর পরে তাঁর বংশধরগণ এই সেবার দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

মধুরাধিপতি শ্রীজগন্নাথদেবের লীলা মাধুর্যমণ্ডিত। দীন, অকিঞ্চন ভক্তকে যেমন অহেতুক করুণাধারায় তিনি অভিষিঞ্চিত করেন, তেমন মদগর্বিত সন্তানকেও কলুষমুক্ত করে কৃপাকরুণায়

সৌভাগ্যবান করেন।

আর এক কাহিনি। বহু বছর আগেকার কথা। হায়দ্রাবাদের এক বিখ্যাত ধনবান শেঠজী—যাঁকে সর্বাধিক ধনী বললেও অত্যুক্তি হয় না—পুরীধামে এসেছেন শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের আশায়। সঙ্গে প্রচুর অর্থ, পরিচারক—আড়ম্বরের ঘাটতি ছিল না। মনে তাঁর ভক্তি যেমন ছিল, অহংকারও কম ছিল না। এহেন যজমানকে সন্তুষ্ট করার জন্য পাণ্ডারা প্রত্যহ ছাপ্পান্ন প্রকারের মহাপ্রসাদ শেঠের কাছে পৌঁছে দিয়ে শ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা বর্ণনা করতেন। সেবাপূজা, ভোগরাগ, আরতি, নীতি-নিয়ম সম্বন্ধে ধারণা দিতেন। একদিন শেঠজী বললেন, ''মহাপ্রভু প্রতিদিন একই রকমের নৈবেদ্য গ্রহণ করছেন, তাঁর অরুচি ধরে যাবে। একটু পরিবর্তন হওয়া দরকার। কাল কিছু নূতন নৈবেদ্যের আয়োজন করা হোক, যা এক লক্ষ টাকার হওয়া চাই।'' একথা শুনে পাণ্ডাদের চোখ ছানাবড়া, বিস্ময়ে তাঁরা বাক্‌রুদ্ধ। তাঁরা বুঝে উঠতে পারছিলেন না কেমন করে তাঁরা অত টাকার ভোগের আয়োজন করবেন, কারণ তখন এক কিলো দুধের দাম দু-পয়সা, এক কিলো ঘিয়ের দাম তিরিশ পয়সা, ভাল অড়হর ডালের দাম এক পয়সা, এক টাকায় পঁচিশ-তিরিশ কিলো বাসমতী চাল পাওয়া যেত। ভোগের অন্যান্য সামগ্রী সব মিলিয়ে ছাপ্পান্ন ভোগের জন্য পঞ্চাশ টাকা হলেও ঢের। কীভাবে এক লক্ষ টাকার নৈবেদ্যের আয়োজন করা হবে? কীভাবেই বা তাঁরা মহাপ্রভুর মান রাখবেন?

উপায় কী? সেবক কোঠ করণ—যিনি ভোগের দায়িত্বে ছিলেন—বললেন, ''আমরা টাকা ফেরত দিয়ে দেব নয়তো অল্প টাকায় ভোগ নিবেদন করে দেব।'' অন্য এক সেবক বললেন, ''এক লক্ষ টাকার ভোগ তো শ্রীমন্দিরের আনন্দবাজারেও ধরবে না।'' আর একজন সেবক বললেন, ''অত চিন্তা কেন? যাঁকে নৈবেদ্য নিবেদন করা হবে, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করা হোক। তিনিই বলে দেবেন উপায়।'' প্রধান সেবক মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে ধ্যানে বসলেন। সেই সময় তিনি দর্পহারী মহাপ্রভুর আদেশ শুনতে পেলেন, ''বড়পাণ্ডা, তুমি চিন্তা কোরো না। শেঠকে বলো আমাদের তিনখানা পান দিতে, পরে নৈবেদ্যের কথা ভাবা হবে। সেই পানগুলিতে গজমোতির চুন দেওয়া থাকবে। একই রকম পান খেতে আর ভাল লাগছে না।''

দেখতে দেখতে প্রভুর এই আদেশের কথা সেবকমহল থেকে শেঠজীর কাছে পৌঁছল। মহাপ্রভুর আদেশের কথা শুনে শীতের দিনেও শেঠজী ঘেমে গেলেন। তাঁর মাথা ঝিমঝিম করছে, শরীর আনচান করছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। তিনি ভাবছেন, ''জ্যান্ত হাতি লক্ষ টাকা, মরা হাতিও লক্ষ টাকা। কিন্তু সব হাতির মাথায় তো মোতি থাকে না। কত হাতি মারলে মোতি পাওয়া যাবে? কত মোতি পুড়লে তিনখানা পানের জন্য চুন পাওয়া যাবে? হে প্রভু, হে জগৎপতি, আমার ত্রুটি মার্জনা করুন।''

অনুতাপে দগ্ধ হয়ে শেঠজী কাঁদতে কাঁদতে মহাপ্রভুকে প্রার্থনা করলেন, ''আমি অত্যন্ত গরিব প্রভু! একখানা পান দেওয়ার সামর্থ্য আমার নেই, আর আমি কিনা লক্ষ টাকার বড়াই করছি! হে ক্ষমার সাগর! তোমার মহিমার সীমা-পরিসীমা নেই। তোমার ওই একটি আদেশে আমার সম্পদ ও সম্মানের অহংকার চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে আমার চোখ খুলে দিয়েছ। তুমি ছাড়া কারও সাধ্য নেই মানুষকে কলুষমুক্ত করে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। মূঢ় মানব বুঝতে পারে না সে গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করছে।''

অনুতপ্ত শেঠজী পূর্ণ শরণাগতি অবলম্বন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। তাই বোধহয় ওড়িশার একটি বহুপ্রচলিত প্রবাদবাক্য : একখানা পান দেওয়ার ধন নেই, অত গরব কীসের!